তাকে বহন করিলাম, বাহন করিলাম না

ব্রতীন চট্টোপাধ্যায়

২০১০ সালটি ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য। ১৯৬১ সাল থেকে রবীন্দ্রস্মৃতি ও ব্যক্তিগত স্মৃতি, রবীন্দ্র সৃষ্টির পুনরাবৃত্ত উচ্চারণের যে উদ্যোগ শুরু হয়ে গেছে তারই নেপথ্যে রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের উৎকণ্ঠার প্রসঙ্গে বলা যায় যে দেশের সমস্ত শিশুর শিক্ষার আয়োজনে এই বছর থেকেই, এদেশে অবৈতনিক—বাধ্যতামূলক শিক্ষার আইন কার্যকর হল। আধুনিক কালের অন্যতম শিক্ষাচিন্তক রবীন্দ্রনাথের জন্মের ১৫০ তম উদযাপনে তাঁর দেশ তাঁকে এর থেকে ভালো কিছু অর্ঘ্য দিতে পারত না। এই আইনের রূপায়নে শিক্ষাক্রম ও শিক্ষক - শিক্ষণের যে প্রাসঙ্গিক পরিবর্তন ইতিমধ্যে প্রস্তাবিত, তার শিক্ষাতাত্ত্বিক বিচার রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারাই অনুসারী।

এমনিতে বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আগ্রহের একটা 'বাঙালি' নিজস্ব কারণ রয়েছে, সেই কারণেই এই রাজ্যের রবীন্দ্র ভাবালুতা তাঁর শিক্ষাচিন্তা সম্বন্ধে আগ্রহী। বাঙালী ভাবালু নয় এমন দাবি করছি না। তবে, শিক্ষাকর্মী হিসাবে দেশের বাইরে ও দেশের বিভিন্ন রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষার যুক্ত লোকজনদের সঙ্গে কথাবার্তার সুবাদে যেটা লক্ষ্য করেছি তা হল, শিক্ষাবিদ হিসাবে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আগ্রহী ও জিজ্ঞাসু প্রশ্ন। এই সমস্ত আগ্রহ, প্রধানত আধুনিক সমকালীনতায় শিক্ষাবিদ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ঔৎসুক্য, আর সেই ঔৎসুক্যের কেন্দ্রে রয়েছে একটা সাধারণ বিশ্বাস— পরিবর্তিত এই সময়ে রবীন্দ্রনাথই তাদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন।

এমন আগ্রহ নিরসনে, যোগ্য সমাধান রবীন্দ্র বিষয়ক রচনা অনুধাবন। কিন্তু সেক্ষেত্রে একটা সমস্যা হল, শিক্ষার বিষয়ক রবীন্দ্ররচনার যথেষ্ট অনুবাদের অভাব। অন্য সমস্যা হল– রবীন্দ্র শিক্ষাচিন্তার উপর লিখিত প্রকাশনার পদ্ধতিগত যুক্তি— প্রথমে রবীন্দ্র রচনা থেকে মানুষের একটা দার্শনিক সংজ্ঞার নির্মাণ এবং তার পরে সেই সংজ্ঞাটিকে সমর্থনকারী থেকে মানুষের একটা দার্শনিক সংজ্ঞার নির্মাণ এবং তার পরে সেই সংজ্ঞাটিকে সমর্থনকারী রবীন্দ্র চেতনা থেকে উদ্ধৃতি সংগ্রহ করে শিক্ষাদানের একটা সাধারণ প্রক্রিয়ার নির্মাণ। বলাবাহুল্য, এমন একটা পদ্ধতির একটা নিজস্ব সমস্যা আছে, একটা Tautology -র ফাঁদ তৈরি হয়। স্বতঃসিদ্ধতার এই যুক্তি থেকে বেরোনো মুসকিল হয়ে পড়ে। এই জাতীয় গবেষণার সিদ্ধান্তকে প্রশ্ন করবার কোনও অবকাশই থাকে না। আর তারই সুবাদে জেগে ওঠে এক জাতীয় মৌলবাদী রক্ষণশীলতা। অথচ পরিবর্তিত এই পৃথিবীতে শিক্ষা ব্যঞ্জনা সমাজে পরিবর্তনের সঙ্গে সমানেই পরিবর্তিত হয়ে চলেছে।

এই সমস্যা ছাড়া, তত্ত্বগতভাবে আরও একটি বিষয় রয়েছে, শিক্ষার সম্বন্ধে দার্শনিক প্রস্তাব প্রকৃপক্ষে মানুষের সংজ্ঞাবাচক। শিক্ষায় তার প্রয়োগ, শেষ পর্যন্ত ওই দার্শনিক মতেরই শিক্ষা হয়ে ওঠার কথা। শিক্ষার দর্শনের শেষ পর্যন্ত দর্শনের শিক্ষা হয়ে ওঠার কথা। যেমন, কোনও ধর্মীয় দর্শন দ্বারা আয়োজিত শিক্ষা, সেই রাজনৈতিক দর্শন দ্বারা প্রত্যায়িত হওয়ার কথা। যে সমাজে শিক্ষা ও ধর্ম সহবাসী, সেই সমাজে এই নিয়ে কোনও সমস্যা হওয়ারই কথা নয়। কিন্তু আধুনিক সমাজ, ধর্মনিরপেক্ষ সাংবিধানিক রষ্ট্রের যুক্তিতেই চালিত। সেখানে ধর্ম ও রাষ্ট্র প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে সহবাসী না হওয়ার এক ভিন্ন পরিস্থিতির সূচনা করেছে। ঐতিহাসিকভাবে এই পরিস্থিতিতেই শিক্ষা তার স্বতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক অস্তিত্বের দাবি করেছে এবং করে আসছে। প্রসঙ্গত, সমাজ ও ধর্ম এর পারস্পরিক সক্রিয়তা একটি প্রাচীন এবং একই সঙ্গে আধুনিক বিতর্কের পরিচিত ক্ষেত্র। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইউরোপের শিক্ষাবিদরা বিতর্কের এই ক্ষেত্রটিকে স্বীকার করেছেন। প্রাক-প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সময়কালের শিক্ষাবিদ রবীন্দ্রনাথ এই ক্ষেত্রটি অনুধাবন করেননি, এমন নয়; কিন্তু, পূর্বোক্ত পদ্ধতিগত গবেষণায় তাঁর শিক্ষা চিন্তার যে বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে সেই সব বৃত্তান্তে এই প্রসঙ্গটি খুব একটা পরিচিত নয়। অথচ, ঐতিহাসিকতার বিচারে, রবীন্দ্রনাথের এই অনুধাবনের প্রাসঙ্গিক বিচার যোগ্য কারনেই আকর্ষণীয় হতে পারে। এই পদ্ধতির আরও যে সমস্যা রয়েছে, তা হল প্রকরণগত ভাবে উদ্ধৃতির প্রয়োগ সংক্রান্ত। আলোচ্য পদ্ধতিতে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা দর্শন ও তার প্রয়োগিক আলোচনার প্রধান যৌক্তিক উপাদান হল, রবীন্দ্র রচনা তেকে উদ্ধৃতি ও তার প্রয়োগ। এখানে একটি সমস্যা রয়েছে, প্রযুক্ত উদ্ধৃতির প্রাসঙ্গিকতা উদ্ধারের সমস্যা। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা চিন্তা সম্বন্ধে কোনও সংহত, তাত্ত্বিক প্রস্তাব রচনা করে যাননি। তেমন কোনও সংহত প্রস্তাব রচনার জন্যেই উদ্ধৃতির প্রয়োজন ও প্রয়োগ। কিন্তু প্রশ্ন হল, ১৮৯২ সালে শিক্ষা বিষয়ক কোনও মন্তব্যের সঙ্গে ১৯৩৮ সালের কোনও একটি মন্তব্যকে কি ভাবে সম্বন্ধযুক্ত করব? ১৯৩৮ সালের মন্তব্যটিতে লেখকের জীবনের যে অভিজ্ঞতা, তা ১৮৯২ সালের জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে যেমন তুলনীয় নয়, তেমনই ১৮৯২ সালের রচনার ঐতিহাসিকতা, ১৯৩৮ সালের ঐতিহাসিকতার সঙ্গেও তুলনীয় নয়। উদ্ধৃতি বোধহয় শুধু বিষয় প্রাসঙ্গিকতা নয়, তার ঐতিহাসিকতাও দাবি করে।

এদেশে অন্যান্য পাঁচটা বিষয়ের মতো শিক্ষা সংক্রান্ত চর্চা শুরু হয়েছে পাশ্চাত্যের ঐতিহ্য মেনে। স্বাধীনতার পরের সময়কালে এদেশের শিক্ষা পরিকল্পনায় পাশ্চাত্যের শিক্ষাবিদদের যে আধিপত্য ছিল তার একটা অনিবার্য ফল হল, পারিভাষিক স্তরে শিক্ষাশাস্ত্রে ব্যবহৃত ইউরোপীয় ধারণাগুলির দেশি পরিভাষার নির্মাণ। নির্মাণ অর্থে যেটা হয়েছে, তাকে প্রতিস্থাপন বলা যেতে পারে। সমস্যা হল, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা বিষয়ক চিন্তা প্রায় মৌলিকভাবে ওই সব পারিভাষিক অর্থ থেকে স্বাধীন। উদাহরণ স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ ব্যবহৃত শব্দগুলিকেই বিচার করা যেতে পারে। শিক্ষা বিষয়ক রবীন্দ্র রচনা উল্লেখযোগ্যভাবে লক্ষ্য করা যায়, 'শিক্ষা' ও 'বিদ্যা' শব্দ দু'টির বিশিষ্ট প্রয়োগ, এই শব্দগুলি এদেশে সাধারণভাবে ইংরাজি 'এডুকেশন'-এর শব্দার্থ দ্বারা প্রতিস্থাপিত। এই শব্দার্থ স্বীকার করে, রবীন্দ্ররচনা প্রযুক্ত 'শিক্ষিতবিদ্যা' শব্দটিকে আবার কোনও 'শিক্ষাতত্ত্ব' দ্বারা গ্রাহ্য মত দিয়ে ব্যাখ্যা করাটা মুসকিল হয়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে, ১৯৪৭ সালের একটি প্রবন্ধে আর্নল্ড অ্যারনসন একটি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তাঁর মতে, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা সম্বন্ধে অনুধাবনের জন্য প্রাথমিকভাবে যেটা দরকার তা হল রবীন্দ্রনাথ প্রযুক্ত শিক্ষা সংক্রান্ত প্রাথমিক ধারণাগুলির একটি সমার্থক পরিভাষার নির্মাণ, যা পাশ্চাত্যের প্রচলিত পরিভাষার সঙ্গে সেতু রচনা করবে। তেমন কোনও

উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এবং যেটা হয়েছে তা হল পাশ্চাত্যের প্রচলিত পরিভাষার সাপেক্ষে রবীন্দ্র শিক্ষা চিন্তার আলোচনা। এর ফলে যেটা হয়েছে তার হল, সাধারণভাবে যে ধারণাগুলিকে বা বিষয়গুলিকে প্রচলিত পাশ্চাত্যানুগ পরিভাষার রবীন্দ্র শিক্ষা চিন্তার আলোচনা। এর ফলে যেটা হয়েছে তার হল, সাধারণভাবে যে ধারণাগুলিকে বা বিষয়গুলিকে প্রচলিত পাশ্চাত্যানুগ পরিভাষা দ্বারা অর্থবহ করা যায়নি, সে সব বিষয়গুলি বর্জন করা হয়েছে বা চোখ এড়িয়ে গেছে এবং যে বিষয়গুলি প্রচলিত পরিভাষার অর্থ দ্বারা অর্থবহ করে তোলা সম্ভব, সেইগুলিকেই গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রচেষ্টার ফলাফল অনুমেয়। এইসব তোলা সম্ভব, সেইগুলিকেই গ্রহণ করা হয়েছে। এইসব প্রচেষ্টার ফলাফল অনুমেয়। এইসব প্রকরণগত সমস্যার পরেও আরও একটি দ্বিধা থাকে, এই সমস্যার সূত্রপাত করে গেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। সমগ্র রবীন্দ্র রচনার গ্রন্থনার কাজ রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালেই শুরু হয়েছিল। তাঁরই ইচ্ছা অনুযায়ী শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধগুলি গ্রন্থিত হয়েছে। ঐতিহাসিক - প্রাসঙ্গিকতায় এই সমস্ত প্রবন্ধ সমসাময়িকতার সঙ্গে সম্পর্কিত। সংকলনের সময়, প্রবন্ধ রচনাকালের সমসাময়িকতার যুক্তি অর্থাৎ প্রবন্ধ রচনার যে ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ, তাই বেশি করে স্বীকৃত হয়েছে বলে আন্দাজ হয়। সংকলনের এই পাঠক থেকে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা সম্বন্ধে কোনও স্থির মন্তব্য নির্মাণ করতে গিয়ে প্রবন্ধ রচনার সমসাময়িকতার বিচার এসেই পড়ে। সমসাময়িকতার এই বিচার রবীন্দ্র জীবনী রচনায়, পদ্ধতিগত স্বাভাবিকতাতেই স্বীকৃত, রবীন্দ্র জীবনী থেকে রবীন্দ্র রচনাকে তো ছিন্ন করে দেখা সম্ভব নয়। কিন্তু এর বিপরীতটা যখন ঘটেছে, অর্থাৎ যখন সেই রবীন্দ্রজীবনী দ্বারা রবীন্দ্রচর্চা বিচার্য হয়েছে, তখন একটা বিপত্তি ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এমনিতে, রবীন্দ্র শিক্ষা চিন্তার বিচারে রবীন্দ্রজীবনী একটি উপাদান হিসাবে বিচার্য হয়ে এসেছে। এর অনিবার্য ফলশ্রুতিতে, রবীন্দ্র শিক্ষাচিন্তার বিচার, রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তথা ব্যক্তিনিষ্ঠতায় আবদ্ধ থাকার প্রবণতা তৈরি করেছে। রবীন্দ্র শিক্ষা চিন্তার বিচারে কোনও বস্তুনিষ্ঠ মন্তব্য করার ক্ষেত্রে এই হল একটা অসুবিধা। রবীন্দ্র শিক্ষা চিন্তা সম্বন্ধে আদৌ কোনও বস্তুনিষ্ঠ মন্তব্য করা যায় কিনা, বর্তমান লেখককে সেই প্রশ্নও অনেকে করেছেন। সম্ভবত এই সব বিচারে বস্তুনিষ্ঠতার অভাবই রবীন্দ্র শিক্ষা চিন্তাকে অনন্যতা দিয়েছে। 'অনন্য' অর্থে, এই শিক্ষা চিন্তাকে বিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়নি। ফলে, পদ্ধতিগত এই ঘরানা এবং যথেষ্ট অনুবাদের অভাব এই রাজ্যের বাইরে রবীন্দ্র শিক্ষা চিন্তা অপরিচিতই থেকে গেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণের সত্তর বছর পরেও !

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তার একটি বিশিষ্ট চরিত্র হল, এই শিক্ষা চিন্তা প্রায়োগিকভাবে নিযুক্ত, এটা অস্বীকার করা যাবে না যে, এই কবি তার অমিত সৃজন ক্ষমতার অনেকাংশ এই শিক্ষাচিন্তার প্রয়োগে নিযুক্ত করেছেন। রবীন্দ্র সৃষ্টি সম্বন্ধে কোন তাত্ত্বিক গবেষণা এই প্রয়োগিক নির্মাণ সম্পর্কিত অনুসন্ধানকে বাদ দিয়ে সম্ভবত পদ্ধতিগতভাবে অসম্পূর্ণ। এমন একটা অনুসন্ধানে আবা একটি পদ্ধতিগত সমস্যা রয়েছে— কোনও শিক্ষা চিন্তার বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়নের প্রেক্ষিত নির্বাচন একটি জনপ্রিয় উপমা ব্যবহার করে বলা যায়, জাহাজ যখন ডোবে তখন জাহাজের নির্মাণের কৌশলই প্রশ্নযোগ্য হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বর্তমানকালের সাফল্য বা অসাফল্য দিয়ে তাঁর শিক্ষা চিন্তাকে বিচার করতে গেলে এই উপমাটি মনে পড়ে যাবে। রবীন্দ্র শিক্ষা চিন্তা অনুধাবনে শিক্ষার চিন্তার সার্থকতা অথবা অসফলতা প্রমাণে প্রশ্ন উথাপনের এই সমস্যাটি থেকেই গেছে। বিতর্কও কম হয়নি বা হচ্ছে না। এই প্রসঙ্গটি, রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শনের অনুসন্ধানকেও প্রভাবিত করেছে।

বস্তুগতভাবে, রবীন্দ্রশিক্ষাচিন্তা অনুধাবনে অন্য যে উপাদান সাধারণভাবে ব্যবহৃত তা হল, রবীন্দ্ররচনা। শিক্ষা বিষয়ক চিহ্নিত এই সব উপাদানকে সাধারণভাবে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। একটি ভাগ, ভৌগলিকতায় বদ্ধ, দুটি বিদ্যালয়ের পরিচালনার প্রয়োজনে লিখিত চিঠিপত্র এবং অন্যান্য রচনা। এইসব উপাদানগুলি ব্যবহারের একটি সমস্যা হল, রবীন্দ্রনাথের অন্তত দুটি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত হওয়া থেকে উদ্ভুত প্রশ্ন। ভিন্ন দুটি বিদ্যালয়ের পরিচালনকে একই চরিত্রযুক্ত বলা যাবে না। দুটি বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য সম্ভবত একই ছিল না। ফলে, রবীন্দ্র শিক্ষা চিন্তাকে একশিলা আকার হিসাবে বিচার করার যুক্তি যোগ্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগে। অথচ, এই বিষয়ে প্রকাশিত রচনা বিচার করলে তো তেমনই প্রতীতি জন্মায়। এছাড়া, অন্য উপাদানটি হল শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ, যা কোনও স্থানীয় কারণ থেকে প্ররোচিত হয়ে রচিত হলেও তার একটা বিশ্বায়িত অর্থ নিষ্কাশন করা সম্ভব। এই প্রবন্ধগুলির অন্য বৈশিষ্ট্য হল, প্রস্তাবিত বিষয়গুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শুধু স্থানীয়তা থেকে উত্তীর্ণ নয়, অনেক ক্ষেত্রের সমসাময়িকতা থেকেও উত্তীর্ণ। প্রসঙ্গত, এই জাতীয় অনেক প্রবন্ধ, উল্লেখিত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আগেই রচিত। একটা প্রশ্ন জাগে, রবীন্দ্র শিক্ষাচিন্তা কি সেই অর্থে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে কার্য - কারণ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া দ্বারা সম্পর্কিত? নাকি, রবীন্দ্র শিক্ষাচিন্তা উল্লেখিত বিদ্যালয়গুলির সাপেক্ষে স্বাধীন তথা তাদের অস্তিত্বের সঙ্গে তথাকথিত কার্য-কারণ দ্বারা সম্পর্কিত নয়। এই জাতীয় প্রশ্ন থেকে যে আগ্রহ জন্মায় তা হল, স্থানীক ও কালীক শর্ত থেকে বিচ্ছিন্ন রবীন্দ্র শিক্ষার অনুসন্ধান। রবীন্দ্রনাথের ১৫০ তম জন্মদিন উদযাপনকালেও এই সব প্রসঙ্গগুলি অনুসন্ধান এবং উত্তরের অপেক্ষায় থাকবে।

সৌজন্যে : আইকোর একদিন (৬/৮/২০১০)